শরৎচন্দ্রের জীবন-বিশ্লেষণ

শ্রীগোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য

চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণী—সাহিত্য বিভাগ।

এমন একটি সাহিত্যিকের জীবন নিয়ে আজ আমি আমি আলোচনা করতে চলেছি, যিনি গতবছর এম্‌নি সময়ে দারুণ অসুখে জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে অস্থির ভাবে দিন কাটাচ্ছিলেন ; এতদিনে তাঁর আত্মা শান্তিলাভ ক'রেছে। এখনো পূর্ণ একবছরও হয়নি, শরৎ চন্দ্র আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন।

মৃত্যুর কথা দিয়ে যখন তাঁর জীবনের কথা আরম্ভ করা গেছে, তখন মৃত্যুর কথাটাই সবার আগে ধরা যাক্। গত বছর শীতকালে হঠাৎ একদিন সংবাদপত্রে খবর প্রকাশ পেলো, দারুণ অন্ত্রের পক্ষাঘাতে ও ক্যান্‌সারে আক্রান্ত হ'য়ে শরৎচন্দ্র নার্সিংহোমে প্রেরিত হ'য়েছেন। তারপর এম্‌নিভাবে রোজই খবর কাগজে তাঁর সম্বন্ধে একটু ক'রে খবর ছাপা হয়,—কখনও তাঁর অবস্থা একটু ভাল থাকে কখনও বা খারাপ। অবশেষে সকল সংবাদের একদিন পরিসমাপ্তি ঘট্‌লো, যে দিন শোনা গেল, অশেষ যন্ত্রণা ভোগের পর শরৎচন্দ্রের আত্মা নশ্বর দেহ ত্যাগ ক'রে চলে গেছে।

এইত গেল তাঁর মৃত্যুর কথা, কিন্তু এই ঘটনার মধ্যে ও একটা জিনিষ বিশেষ ভাবে লক্ষ্য কর্‌বার আছে। তাঁর এই সাংঘাতিক অসুখের খবর সঙ্গীন মুহূর্ত্তের পূর্ব্বে বাইরের লোক মোটেই জান্‌তে পারেনি। বহুদিন ধ'রেই পেটের অসুখে তিনি কষ্ট পাচ্ছিলেন। ১৩৪৩ সালের আষাঢ় মাসের "ভারতবর্ষে" আমরা এই অসুখের একটুখানি আভাষ পাই। চেঞ্জের উদ্দেশ্যে তিনি গিয়েছিলেন দেওঘর,—সেখানকার একটি হতভাগ্য কুকুরের কথা তিনি "দেওঘরের স্মৃতিতে" "ভারতবর্ষে" প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তখনও আমরা তাঁর শরীরের অসুস্থতা সম্বন্ধে বিশেষ কোন খবর জানি না। তারপর অকস্মাৎ একদিন নার্সিংহোমে তাঁর দুরারোগ্য ব্যাধির সংবাদ প্রকাশিত হ'লো। দেশের লোক বিস্ময়ে স্তম্ভিত হ'য়ে উঠ্‌লো একটা কথা ভেবে,—এতবড় একজন লোকের এতবড় একটা অসুখের খবর এতদিন চাপা ছিল কি ক'রে!

স্বভাবতঃই রবীন্দ্রনাথের কথা এইখানে আমাদের মনে ভেসে উঠে। রবীন্দ্রনাথের সামান্য সর্দ্দি-কাসির সংবাদও যথাসময় কাগজে প্রকাশিত হয়, অথচ শরৎচন্দ্রের বেলাই বা তাহা হয় নাই কেন? রবীন্দ্রনাথের বেলাই বা সে সংবাদ কি ক'রে প্রকাশ পায়, যে সংবাদ

শরৎচন্দ্রের বেলা মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত চাপা থাকে ? গভীরভাবে সে কথা আমাদের ভেবে দেখ্‌তে হবে।

এই তত্ত্বের প্রধান কারণ হ'লো শরৎচন্দ্রের নিভৃত জীবন যাপন। রবীন্দ্রনাথ সর্ব্বদা তাঁর চতুষ্পার্শ্বে যেমন এক পরিমণ্ডল রচনা ক'রে চলেন, শরৎচন্দ্র তা চ'লতেন না। ভক্তের অভাবেই তিনি যে এই পরিমণ্ডল রচনায় অকৃতকার্য্য হয়েছিলেন, এ কথা বোধ হয় তাঁর অতি বড় শত্রুরাও বল্‌তে কুণ্ঠিত হবে। আসল কথা ছিল তিনি এসব পছন্দ কর্‌তেন না। আমাদের দেশে এক অরবিন্দ ছাড়া এমন আর একটিও মহালোক আছেন কিনা সন্দেহ, যিনি নিজেকে যথাসম্ভব লোক-চক্ষুর অগোচরে রেখেও এতখানি উচ্চ আসন লাভ ক'রেছেন। এই নিভৃত জীবন যাপন করার ফলেই তাঁর এই পীড়ার সংবাদ প্রথম অবস্থায় সাধারণ্যে প্রচার লাভ করেনি। তাঁর এই বিশেষ প্রকৃতির সঙ্গে সম্যকরূপে পরিচিত থাকার ফলেই বোধ হয় তাঁহার নিকট আত্মীয়েরা—যারা তাঁর কাছে ছিলেন—তাঁরা এই ব্যাপার নিয়ে হৈ চৈ ক'র্‌তে সাহস করেন নাই। শেষের দিকে দেশের লোকের কাছে দায়ী হ'বার ভয়েই বোধ হয় সংবাদটা প্রকাশিত হ'য়েছিল। কারণ শরৎচন্দ্র ছিলেন সারা বংলাদেশের বাঙ্গালীর সম্পত্তি—নিকট বা দূর সম্পর্কের আত্মীয়তা সূত্রেই সেখানে কেবলমাত্র জয়ী হ'য়ে থাক্‌বেন।

বস্তুতঃপক্ষে শরৎচন্দ্র নিজেকে যথাসম্ভব আধুনিক সমাজের আবহাওয়া থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। সাধারণের সহজ কাজেও তিনি সহসা যোগ দিতেন না, যদিও যোগ দেওয়া থেকে তিনি এবেবারে বাদ পড়েননি। বড় বড় সাহিত্য-সভার অধিবেশনে তাঁর মত একজন এতবড় সাহিত্যিককে খুব কমই দেখা যেতো। নিজের প্রচার কার্য্য করার দিকেও লোভ তাঁর আদৌ ছিল না। সহরের সম্ভ্রান্ত পল্লীতে বাড়ী তৈরী করায় পাছে তাঁকে সাধারণ্যে প্রকাশ পেতে হয় এই জন্য বালীগঞ্জে বাড়ী তৈরী করবার দিকেও তাঁর নাকি বিশেষ ঝোঁক ছিল না। একটি নিরিবিলি পাড়াগাঁয়ে সাধারণ অবস্থায় থাক্‌তে পেলেই তিনি নিজেকে যথেষ্ট সুখী মনে ক'র্‌তেন।

কিন্তু আধুনিক সমাজকে পরিহার ক'র্‌তে চাইলেও সমাজের সঙ্গে তাঁর যোগ-সূত্র মোটেই ছিন্ন হয়নি। তাঁর গভীর সংযোগ ছিল সমাজের নিম্নস্তরের ভাগ্যহত নর-নারীর সঙ্গে তাদের কাছে তাঁর পরিচয় ছিল দেশের একজন অতিবড় সাহিত্যিক হিসেবে নয়,—তাদেরই সম-পর্য্যায়ের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে। শরৎচন্দ্র ছিলেন তাদের আদরের "দাদা-ঠাকুর,—যিনি তাদের মাঝে বসে একসঙ্গে নানা ধরণের সুখ দুঃখের গল্প ক'র্‌তে পারেন তাদের অসুখ-বিসুখে ডাক্তারী বই দেখে আবার হোমিওপ্যাথী ঔষধ দেন। মাঝে মাঝে শরৎচন্দ্রকে তাদের মাঝে বস্ত্র এবং অর্থ বিতরণ ক'র্‌তে দেখা যেতো। এক কথায় ব'ল্‌তে গেলে শরৎ

চন্দ্রের অনুপস্থিতি তারা মোটেই সহ্য ক'র্‌তে পার্‌তো না। তাই সাম্‌তাবেড়েতে শরৎচন্দ্রের পল্লীভবনে যখনই কোন নতুন আগন্তুকের উদয় হ'তো, তখনই সেখানকার লোকেরা সন্দেহাকুল চিত্তে তাকে এক নতুন উৎপাত ব'লে মনে ক'র্‌তো। তাদের ভয় ছিল পাছে তাদের আদরের "দাদাঠাকুরটিকে" বাইরে কোথাও বক্তৃতা দিতে ধ'রে নিয়ে যাওয়া হয়, যার ফলে কিছুদিন তাদের শরৎচন্দ্রের সাহচর্য্যে বঞ্চিত থাক্‌তে হ'বে।

সাধারণ অজ্ঞ পল্লীবাসীদের ওপর শরৎচন্দ্রের এম্‌নি ছিল প্রভাব—তাদের সঙ্গে ছিল তাঁর এম্‌নি নিগূঢ় পরিচয়। অশিক্ষিত ও দরিদ্র জনসাধারণের দারিদ্র্য ও ভাগ্যের সহিত জানা-শুনা ছিল তাঁর অসম্ভব রকমের। এই তাঁর রচনার মধ্যে আমরা এই সব ভাগ্যবিড়ম্বিত নর-নারীকে ভিড় করিয়া থাকিতে দেখি। তাদের অভাব ও অজ্ঞতার কথা উপন্যাসের মধ্যে তিনি শিক্ষিত সমাজকে জানিয়ে দিয়ে গেছেন, তাদের সেই অভাব ও অজ্ঞতা মোচনের উপায়ও তিনি নির্দ্দেশ ক'রে দিয়েছেন,—উন্নত সমাজ যাতে অন্ধকারের মাঝখান থেকে তাদের আলোয় নিয়ে আস্‌তে পারে, তাদের দুঃখের ভার কিছুও লাঘব ক'র্‌তে পারে। তিনি চেয়ে ছিলেন অসংখ্য ত্রুটিপূর্ণ এই অনুন্নত সমাজের সংস্কার—সংহার নয়। এই সমাজের মাঝখানেই তাই তাঁর আসনখানি ছিল পাতা।

আগেই বলা হ'য়েছে, নিভৃত জীবন-যাপনের শরৎচন্দ্র ছিলেন পরম পক্ষপাতী। কেন যে তাঁর স্বভাব এমন ছিল, এই ব্যাপারের কারণ অনুসন্ধান ক'রতে অনেকে যথেষ্ট শ্রম ক'রেছেন। কেউ বলেন,—তাঁর মধ্য-জীবনের সংস্রবে এমন সব অবাঞ্ছিত ঘটনার যোগ ছিল, যা গোপন করবার জন্যে তিনি সাধারণের কাছ থেকে নিজেকে যথাসম্ভব দূরে সরিয়ে রেখে ছিলেন। এই সব অনুমানের মূলে কতখানি সত্য নিহিত আছে, আজ আমরা সে কথার জবাব দিতে পারবো না। শরৎচন্দ্রের বর্ম্মা-জীবন আমাদের কাছে পরম রহস্যে আবৃত। শরৎচন্দ্রের জীবনের সেই দিনগুলি আমাদের কাছে ইতিহাসের "Dark Age" এর সমান। তবে শরৎচন্দ্রের একটু যে লাজুকভাব ছিল, আর সেই জন্যেই সব সময় তিনি সাধারণ্যে প্রকাশ পেতে চাইতেন না, একথায় অনেকখানি সত্যের ছাপ আছে। তাঁর স্বভাব ছিল অনেকটা মজলিসী ধরণের—যে ধরণের লোক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, রজনীকান্ত সেন আর অমৃতলাল বসু। কোন সভায় গিয়ে কারও সঙ্গে তাঁর আলাপ হবার সম্ভাবনা খুব কমই ছিল। তবে যিনি একবার কোনও রকমে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে অথবা বিনা পরিচয়েই তাঁর বৈঠখানায় গিয়ে হাজির হ'তে পার্‌তেন,—তাঁর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের গল্প করার বিরাম থাক্‌তো না। আমি যেন কল্পনায় দেখ্‌তে পাচ্ছি সেই মজলিসী ধরণের মানুষটিকে,—যিনি সন্ধ্যার পর কমলাকান্তের ন্যায় আফিংয়ের নেশায় বিভোর হ'য়ে গড়্‌গড়ার সুদীর্ঘ নল হাতে ধূমপানের সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতৃমণ্ডলীকে গল্পের পর গল্প শুনিয়ে চ'লেছেন। তাঁর সেই সকল